The Telegraph
YOUNG
metro

আনন্দবাজার পত্রিকা
অনলাইন সংস্করণ

সানন্দা

আজকাল

MINU BUDHIA

askminubudhia@caringminds.co.in

Don't be a bully, don't be bullied either

MINU BUDHIA
Psychotherapist & counsellor; Founder & director, Addlife Caring Minds

Who is a bully?

What is the reason behind bullying?

What to do if you are being bullied?

How to stop being a bully

THEY ARE BULLIES TOO

Checklist

SNAPSHOTS OF LIFE ON SCHOOL CAMPUS

Holi blast

Rally for rights

Text by Jhinuk Mazumdar, pictures by Arindya Shankar Roy

Spirit of sports

ARNAV KS
Sports teacher, Sri Sri Academy

Silver jubilee for Sahay

Annual sports

Lessons in the school of love

THE WONDER YEARS OF TEEN ROMANCE

MINU BUDHIA
Psychotherapist & Counsellor
Founder Director
Additive Caring Minds

SNAPSHOTS OF LIFE ON SCHOOL CAMPUS

A new beginning

Boys in dhotis perform a dance with bamboo sticks

Two students of the school begin the auspicious day with a Ganesh Vandana

Time for a big lesson! Boys are all smiles in their new classrooms, complete with a blackboard, desks, benches and fans

Draped in saris and hair pulled back in buns decorated with leaves, girls greet the guests with a tribal dance while a teacher accompanies them on a dhol

Text by Trina Chaudhuri, pictures by Arnab Mondal

For students of Upper Infant at Mahadevi Birla World Academy it was a tram ride they will not forget in a hurry.

Abode of hope

Text sent by school

Pictures by Arnab Mondal

Beat the exam blues, with a smile

It is that time of the year again when students gear up for their board examinations or annual examinations. Exam stress is now an established phenomenon and no longer something that affects only a handful. The pressure to perform and get good marks affects not just a lot of students; even parents suffer from symptoms of anxiety on behalf of their wards. While a certain degree of stress and fear about performance can have a motivating impact on students, one often gets to hear of cases where exam stress has become extreme and begun to interfere with routine activities

MINU BUDHIA
Psychotherapist & counsellor;
Founder & director,
Addlife Caring Minds

BEAT THE ODDS

Feeling anxious before a big exam may always be a part of student life, but letting that anxiety turn into stress does not have to be. An essential part of understanding how to deal with exam stress is to first figure out why you feel it. The most common reasons students cite for exam stress are:

- **Parents' and teachers' expectations.** Do your best. You can't pluck stars.
- **Your own expectations.** Don't be so hard on yourself. Take it easy.
- **The desire to get into a particular stream or course of study after the examination.** Getting anxious will lead you nowhere.
- **The feeling of being under-prepared, trying to beat the marks an elder sibling or a cousin got in his/her exams and so on.** [illegible]
- **Fear of forgetting everything during exams.** [illegible] ... so RELAX !!!

If anything else is worrying you, keep that worry in a different compartment of brain so that you can deal with it later. Think about these reasons... which of them apply particularly to you

HOW TO MANAGE STRESS

Learn to recognise when you're stressed out. A small break or a chat with someone who knows the pressure you're under will help you put things in perspective

- Avoid comparing your abilities with your classmates. Those "Oh my god, I've only read the chapter three times" conversations are such a wind-up. Everyone approaches revisions in different ways, so just make sure you've chosen the method that works best for you. Make a realistic timetable and stick to it.
- Sleep well. Wind down before bed and don't revise under the blanket — your bed is a place of rest, not a desk. Get your sleep even if it is three-four hours, it improves memory and concentration.
- Tea or coffee is good for concentration, but not in large amounts. Try to eat one nutritious meal daily.
- Find out which is the best time for you. Morning or evening? Are you a night bird or a morning person? Study that time of the day. Learn to manage the time according to your schedule instead of panicking. Make a schedule for your lessons. Follow that.
- If your concentration is low, take small breaks. A little bit of anxiety is always positive. You work well under pressure.
- During exams don't rush... concentrate and tackle the question you know the best. The one you are not so sure about, attempt it last.
- Steer clear of any exam "post-mortem". It doesn't matter what your classmate wrote for question 1(b), it's too late to go back and change your answers. So it will just make you worry even more. Once you are out of the hall, forget about what you just wrote and concentrate on the next exam.
- Ultimately, don't lose sight of the fact that there is life after your exams. Things might seem a little intense right now, but it won't last forever. This exam is not the end of the world.

SYMPTOMS — IT'S NORMAL TO FEEL THESE THINGS

Physical symptoms: Headache, stomach cramps, loss of appetite, loss of sleep

Psychological symptoms: Feeling low, short temper, anxiety, worrying about trivial issues, low concentration, low self-esteem

SO, SAY GOOD-BYE TO EXTREME EXAM STRESS. BEST OF LUCK FOR YOUR STUDIES!

POET'S CORNER

You...

[illegible]

ISHIKA MITRA
Class X, Auxilium Convent School

Montessori expert Chitrita Chatterjee speaks at a seminar at Dew Drops. Picture by [illegible]

Montessori school celebrates birthday

Dew Drops, a Montessori school for children, celebrated its third anniversary recently. [illegible]

Text by Shamik Chakraborty

How to have fun with science

[illegible]

Educator Pragya Nopani performs a series of experiments at a workshop in South City International School, explaining to students the basic concepts of physics and talking to teachers about ways they can make the process of teaching science subjects more fun and interesting in class. Pictures by Arnab Mondal

[illegible]

Text by Avinanda Mitra

অভিভাবকরা অনেক সময়েই সন্তানের অবসাদের লক্ষণকে গুরুত্ব দেন না। ভেবে নেন, বাচ্চা আসলে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। ফাইল চিত্র।

যে কোনও বয়সের যে কোনও মানুষ অবসাদগ্রস্ত হতে পারেন। বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থায় অবসাদে ভোগার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। বিশেষ করে, কোনও শারীরিক বা আবেগজনিত জোরালো আঘাত (ট্রমা) বা হেনস্থার ফলে এমন হতে পারে। কখন বা কী অবস্থায় এক জন মনস্তত্ত্ববিদের কাছে যেতেই হবে, পরামর্শ নিয়ে সঠিক রোগ চিহ্নিত করতে হবে, তারও কিছু লক্ষণ রয়েছে। যেমন—

• ঘুমের ধরনে পরিবর্তন: বেশি ঘুমানো, খুব কম ঘুমানো, ঘুমের মধ্যেও অস্থিরতা

• খাদ্যাভ্যাসে আমূল পরিবর্তন: খুব বেশি খাওয়া, কম খাওয়া, বার বার খাওয়া

• সামাজিক ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন: রাগের সঙ্গে মারাত্মক আবেগপ্রবণতা, এক টানা কান্না, আগ বাড়িয়ে ঝগড়া করা

• ক্লান্তি অনুভব করা, আশাহীনতা, অসহায়তায় ভোগা, দুশ্চিন্তায় ভোগা

• পছন্দের কাজ, হবি, খাবার, খেলা, ক্লাস, বন্ধুদের সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলা

• পড়াশোনা খারাপ হতে থাকা: মনোযোগ কমা, আগের তুলনায় পড়াশোনার কাজে গতি কমে আসা, স্কুলে যেতে অনীহা

• বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা

• নিজের ক্ষতি করার চেষ্টা বা নেশায় আসক্তি

• ধূমপান বা মদ্যপানের অভ্যাস শুরু করা

• আত্মহত্যার চিন্তা বা আত্মহত্যার চেষ্টা

আপনার যদি মনে হয়, এ মধ্যে যে কোনও একটা আচরণ আপনার সন্তানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, দ্রুত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। মাথায় রাখতে হবে— এর মধ্যে মাত্র এক-দুটো উপসর্গ নিয়মিত ভাবে থাকলে, বা সবকটা উপসর্গই অনিয়মিত ভাবে থাকলে তা অবসাদের লক্ষণ নাও হতে পারে। তবে রোগ আছে কি নেই তা নির্ণয়ের জন্য একজন মনস্তত্ত্ববিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে।

Anandabazar Patrika (Online)- 26.07.2020
continued...

আনন্দবাজার পত্রিকা
অনলাইন সংস্করণ
২৬ আশ্বিন ১৪২৭, সোমবার ■ ১২ অক্টোবর ২০২০ ■ ই-পেপার

মিনু বুধিয়া

২৬ জুলাই, ২০২০, ২০:২৪:২০
শেষ আপডেট: ২৭ জুলাই, ২০২০, ০৩:০০:০৯

নিঃশব্দ ঘাতক অবসাদ: এই লক্ষণগুলি আপনার সন্তানের নেই তো?

বিশ্বে অর্ধেকেরও বেশি মানসিক অসুখের সূত্রপাত ১৪ বছর বয়সে। ছবি: শাটারস্টক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ হু অবসাদের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। হু'র মতে, "সারা ক্ষণ মনের মধ্যে একটা দুঃখের ভাব, সাধারণত যে সমস্ত কাজ করতে আপনি ভালবাসতেন তাতেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলা, রোজের রুটিন মেনে চলার অক্ষমতা— এগুলি যদি দু'সপ্তাহ বা তার বেশি স্থায়ী হয়", তবে আপনি অবসাদগ্রস্ত।

অবসাদ নিয়ে বেশ কয়েকটি উদ্বেগজনক পরিসংখ্যানও দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তার কয়েকটি হল—

- বিশ্ব জুড়ে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিরা যে অসুখে সবচেয়ে বেশি ভোগে, সেই তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে অবসাদ।
- ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সিরা সারা বিশ্ব জুড়ে যে অসুখে সবচেয়ে বেশি ভোগে, সেই তালিকায় ১৫ নম্বরে রয়েছে অবসাদ।
- বিশ্বে অর্ধেকেরও বেশি মানসিক অসুখের সূত্রপাত ১৪ বছর বয়সে। অথচ, বেশিরভাগই নির্ণয় করা যায় না বা নির্ণয় করা গেলেও তার চিকিৎসা শুরু হয় না।
- সারা বিশ্বে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সিদের মৃত্যুর তৃতীয় বড় কারণ হল আত্মহত্যা।

আরও পড়ুন: ‘ফেল’ নয়, ‘এসেনশিয়াল রিপিট’, সিবিএসই বোর্ডের সিদ্ধান্তে প্রভাব পড়বে পড়ুয়া মনস্তত্ত্বে?

অনেক সময়েই কিশোর বা কিশোরীটি অবসাদে ভোগে, কিন্তু সাহায্য কী ভাবে চাইবে তা বুঝতে পারে না। ফাইল চিত্র।

মনোচিকিৎসক বা মনোবিদরা এমন সব লক্ষণ চিহ্নিত করলেও, অভিভাবকরা কিন্তু অনেক সময়েই সন্দিগ্ধ এবং বিভ্রান্ত থাকেন এটা ভেবে যে— এগুলি সত্যিসত্যিই তাঁদের সন্তানের অবসাদের লক্ষণ তো? বা এ সবের মধ্যে দিয়ে বাচ্চা মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে না তো?

এটা মনে রাখতে হবে, মনোযাগ আকর্ষণকারী যে কোনও আচারব্যবহারের মধ্যে কিন্তু, সাধারণ ভাবে, সাহায্য চাওয়ার বার্তা বা সিগন্যাল থাকে। যখন আপনার বাড়ির কিশোর বা কিশোরী সন্তানটি অবসাদে ভোগে বা কোনও সমস্যায় পড়ে, কিন্তু সাহায্য কী ভাবে চাইবে তা বুঝতে পারে না, তারা এমন সব আচরণ করে ফেলতে পারে যেগুলিকে ‘দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। যদি চার থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই ধরনের ব্যবহার চলতেই থাকে, যদি তার রোজের জীবনযাত্রায় রুটিনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তবে একজন কাউন্সেলর বা মনোবিদের কাছে চলে যাওয়াটাই সঠিক কাজ।

কোনও ছেলেমেয়ের অবসাদ রয়েছে বলে মনোবিদ সন্দেহ করলে, বাবা-মা’র মনে সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্নগুলি ঘোরাফেরা করে, তার একটি হল— **‘অবসাদের কি আদৌ কোনও চিকিৎসা রয়েছে’?**

এক কথায় উত্তর হল— হ্যাঁ, অবসাদের চিকিৎসা রয়েছে। একই ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় পীড়িত প্রত্যেকটি মানুষ সাড়া দেন আলাদা আলাদা ভাবে এবং একেবারেই নিজের মতো করে। অবসাদের ক্ষেত্রেও তাই। কারও ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় হয়ত বেশি সময় লাগে সারতে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়মিত থেরাপি এবং ওষুধে (কখনও দু’টি একসঙ্গে, কখনও যে কোনও একটাতেই) সেরে যায়। ওষুধের কথা বললে অনেক অভিভাবকেরই মনে হয়, ওষুধ আদৌ জরুরি কি না। ‘হ্যাঁ’ বললে প্রশ্ন ওঠে, এতে কি অভ্যাসে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না! ডায়াবিটিস বা হাঁপানির মতো অসুখের ক্ষেত্রে যদি কোনও মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে ওষুধ খান, বিশেষ করে কম বয়সি প্রাপ্তবয়স্করাও, তা হলে সন্তানের মন ভাল রাখতে এবং জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারে যে ওষুধ, তা এড়িয়ে চলা হবে কেন? প্রতিটি মানুষ ওষুধের ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে সাড়া দেন, এবং একজন দক্ষ মনোচিকিৎসক কোন রোগীর ক্ষেত্রে সেরা ফলাফল কী ভাবে হবে তা বিচার করে ওষুধের সঠিক ডোজ ঠিক করে দেন।

Anandabazar Patrika (Online)- 26.07.2020
continued...

আরও পড়ুন: : মানসিক চাপ কমাতে মদ্যপান? বাড়ছে কোভিডের ঝুঁকি

১০ থেকে ১৪ বছর বয়সিরা বিশ্ব জুড়ে যে সব অসুখে সবচেয়ে বেশি ভোগে, সেই তালিকায় ১৫ নম্বরে রয়েছে অবসাদ। ফাইল চিত্র।

আর একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হই— সন্তানের মধ্যে অবসাদ যাতে বাসা না বাঁধে, সে জন্য এক জন অভিভাবক হিসেবে আমি কী করতে পারি?

নিশ্চিত ভাবে কখনওই বলা যায় না যে কোনও মানুষ কখনওই অবসাদে ভুগবেন না। অবসাদ রোখার অন্যতম পন্থা হল বাড়িতে চিন্তামুক্ত একটা খোলামেলা পরিবেশ গড়ে তোলা। এমন একটা পৃথিবীতে আমাদের বাস, যা সব সময় বদলে বদলে যাচ্ছে, প্রযুক্তিই শাসন করছে এই বিশ্বকে। সে ক্ষেত্রে একজন অভিভাবক হিসেবে আমাদের বুঝতে এবং মানতে হবে— এমন বেশ কিছু জিনিস আজকের কিশোর মনকে প্রভাবিত করছে, চাপে ফেলছে, যা আমাদের সময় ছিল না। তাই খোলা মনে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে সন্তানের সঙ্গে, যাতে যে কোনও ধরনের বিষয় নিয়ে সন্তান আলোচনা করতে পারে বাবা-মায়ের সঙ্গে।

এখানে আর কয়েকটা কথা গুরুত্বপূর্ণ— এক) উত্তর দিতে গিয়ে আপনাকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, এমন প্রশ্ন বাচ্চাদের দিক থেকে এলে তাকে বকাঝকা করবেন না। দুই) কোনও বাচ্চার সঠিক প্রতিভা বিকশিত করতে অনেক সময়ই সত্যিকারের উৎসাহ প্রয়োজন হয়। পড়াশোনা, খেলা, সংস্কৃতি, হবি এগুলির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে হবে সন্তানকে। তিন) আপনি নিজে বিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ পেয়েছেন, ক্রিকেট ভালবাসতেন, বেহালা বাজাতেন বিস্ময় প্রতিভার মতই। কিন্তু আপনার সন্তান যে একই পথ অনুসরণ করবে এমনটা নয়। চার) সন্তানের যে বন্ধুদের আপনি পছন্দ করেন না, তাদের বাছবিচার করা ঠিক নয়। খুব বিপজ্জনক বা গুরুতর হলে তবেই পর্যবেক্ষণ বা মনিটরিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সন্তানের সঙ্গে কথা বলার সময় হৃদয়ের দরজা খোলা রাখার মানসিকতা নিয়ে চলতে হবে। আর এতেই আপনি আপনার বাচ্চার কিছু কিছু মনের চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারবেন।

Anandabazar Patrika (Online)- 26.07.2020
continued...

যদি সন্দেহ হয়, আপনার সন্তানের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিন্তু সে খোলাখুলি তা বলতে পারছে না, তবে আপনি নিজে শান্ত ভাবে এবং গুছিয়ে তার সঙ্গে কথা বলুন। বলতে হবে যে, আপনার মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত তারা মানসিক চাপে রয়েছে কিংবা কোনও কিছু নিয়ে তাদের মন খারাপ, বলতে চাইলে আপনি তা শোনা জন্য তৈরি বা আগ্রহী। যদি সঙ্গে সঙ্গে সে কিছু বলতে না চায়, তবে অতিসক্রিয় হয়ে পড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সন্তানকে বলতে হবে, তাদের আপনি 'স্পেস' দিতে পারলে খুশি হবেন এবং যখন তারা চাইবে, তখনই যেন কথা বলে। পরিস্থিতি যাই হোক, আপনি যে সবসময় পাশে আছেন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এটা বেশ কয়েক বার পরখ করে দেখুন, আপনার বাচ্চা কথা বলবেই।

আমাদের বুঝতে এবং মানতে হবে— এমন বেশ কিছু জিনিস আজকের কিশোর মনকে প্রভাবিত করছে, চাপে ফেলছে, যা আমাদের সময় ছিল না। ফাইল চিত্র।

আর একটা কথা— কাঁদবেন না, 'ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল' করবেন না, সন্তানের মনে অপরাধবোধ জাগানোর চেষ্টা করবেন না। বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরী সমস্যা ভাগ নিতে ভয় পায় পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে। যদি আপনার কাছে সন্তান নিরাপদ বোধ করে, ভালবাসা পায়, তাঁকে কখনও তুল্যমূল্য বিচার না করা হয় যদি, তা হলে আজীবন সন্তান ও বাবা-মায়ের সুস্থ সম্পর্ক বজায় থাকবে।

উপরে যে আলোচনা করলাম, তার বাইরেও কিশোরমন আর অবসাদ নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন মাঝেমধ্যেই আসে। তেমন কিছুর কথা সংক্ষেপে নীচে বলা হল।

১) অনেক কিশোর-কিশোরীর ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিতে তৈরি হয় প্রথম সম্পর্ক, ব্রেক আপও হয় হাই স্কুলে, তা থেকেও অবসাদ আসে। একজন অভিভাবক হিসেবে কী ভাবে সাহায্য করব সন্তানকে?

যদি কান্না পেয়ে ভেঙে পড়ার একটা কাঁধ থাকে, তা হলে সাহায্য করা সম্ভব। তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক যদি আত্মহত্যার কথা বলেন, তবে তা হালকা ভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। ফাইল চিত্র।

যখন আপনার সন্তান প্রাক-বয়ঃসন্ধিতে বা সবেমাত্র ডেটিং শুরু করেছে

- ডেটিং নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে হবে
- নানা রকমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে হবে
- সম্পর্কের নানা পর্যায় নিয়ে কথা বলতে হবে
- জীবনশৈলির পাঠ দিতে পাখি কিংবা মৌমাছি নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে
- অনুমতির মানে কী তা তাদের বোঝাতে হবে।

যদি কোনও কিশোর বা কিশোরীর সম্পর্ক ভেঙে যায়

- কোনও রকম প্রশ্ন না তুলে, তাদের কথা শুনতে হবে।
- বুঝতে হবে এবং মানতে হবে যে, সন্তানের সত্যিসত্যিই মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে
- কোনও রকম উপদেশ নয়, বরং কিছু দিন পর এই বিষয়ে কথা বলুন। শোক সামলে ওঠার সময় দিন।
- বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করলে চিকিৎসক বা কাউন্সেলরের পরামর্শ নিতে হবে দ্রুত।

Anandabazar Patrika (Online)- 26.07.2020
continued...

২) দুশ্চিন্তা হচ্ছে যে, অবসাদ থেকে আমার সন্তান ড্রাগ কিংবা মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। কী ভাবে সাহায্য করব?

তবে সন্তানের আচার-আচরণে পরিবর্তন দেখে যদি এমন মনে হয়

• আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করুন যে কী ভাবে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। দু'জনে সব বিষয়ে একমত না হলেও, সন্তানের সঙ্গে কথা বলার সময় তা এক হয়েই বলতে হবে।

• সঠিক কারণে কথা বলতে হবে। লোক কী বলছে তা ভেবে নয়, বরং তদের স্বাস্থ্যের দিকটি ভেবে আপনি চিন্তিত, কথা বলুন সে দিকটি ভেবেই।

• কথা বলার জন্য এটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, এ ভাবে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে। যাই হোক আপনি তাকে ভালবাসেন, এ কথা বোঝাতে হবে।

• এর পরে কী হতে পারে, তা নিয়ে উপদেশ দিতে শুরু করবেন না। প্রথমে বুঝতে হবে যে, আসলে কী পরিস্থিতি রয়েছে।

• সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তবে সেটিকে হুমকি হিসেবে ব্যবহার করবেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়ত রিহ্যাবের ব্যবস্থা করতে হবে।

• যদি সন্তানকে মদ্যপান করতে দেখেন বা মাদক সেবন করতে দেখেন বাড়িতে, সরাসরি কথা বলুন।

• প্রমাণ জড়ো করে রাখুন যদি সম্ভব হয়। ড্রয়ার, ম্যাট্রেস, ঘরের বাইরে বা ভিতরে থাকা গাছের পিছনও পরীক্ষা করে দেখুন।

৩) অবসাদ ও আত্মহত্যা

অদৃশ্য অথচ অত্যন্ত বিপজ্জনক মানসিক সমস্যা অবসাদ, যা প্রায়শই অবহেলা করা হয় বা নজর এড়িয়ে যায়। এটা নিঃশব্দ ঘাতক। আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ। আত্মহত্যা সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্ন যা অভিভাবকরা করে থাকেন, সেগুলি উল্লেখ করা হল।

আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষটি সবসময় সাহায্যের জন্য একটা সিগন্যাল দেবেই। ফাইল চিত্র।

আত্মহত্যা রোখা সম্ভব? আত্মহত্যার হুমকিকে কি সত্যি ধরে নিতে হবে?

সঠিক সময়ে সঠিক সাহায্য আত্মহত্যা রুখতে সক্ষম। আমাদের জীবনে যে মানুষগুলো রয়েছে, তাদের আবেগ সম্পর্কে যদি সত্যিই আমরা বুঝতে পারি, যদি সহানুভূতিশীল হওয়া যায়, যদি ভাল ভাবে শোনা যায় সমস্যাগুলো, কান্না পেয়ে ভেঙে পড়ার একটা কাঁধ থাকে, তা হলেই সাহায্য করা সম্ভব। তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক যদি আত্মহত্যার কথা বলেন, তবে তা হালকা ভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। দ্রুত পরিবারের সদস্যদের তা জানাতে হবে। সংকটকালীন হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে হবে।

কী করে একজন অভিভাবক বুঝতে পারবেন যে তার সন্তান আত্মহত্যাপ্রবণ? এ সংক্রান্ত কোনও লক্ষণ আছে কি যা দেখে বোঝা যায়?

আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষটি সবসময় সাহায্যের জন্য একটা সিগন্যাল দেবেই।

• আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ

• মৃত্যু কথা বলা কিংবা সমস্যার সমাধান হিসেবে মৃত্যুর কথা বলা

• ক্রনিক ব্যথা বা অসুখ

• কঠিন মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাওয়া— যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু, বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া

• শারীরিক হেনস্থা, যৌন হেনস্থা, আবেগজনিত অভিঘাত

অবসাদে ভুগছে কিংবা আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে এমন সন্তানদের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা কীভাবে সাহায্য করতে পারেন? যদি ছেলেটি বা মেয়েটি জীবন শেষ করে দেওয়ার কথা বলে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে কী করবেন অভিভাবক?

কথা বলুন। ভাল ভাবে শুনুন। দোষী সাব্যস্ত করবেন না, নিজের জীবনের কোনও রকম উদাহরণ দেবেন না। সমাধানের তালিকা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন না। শুধু পাশে থাকুন। বুঝিয়ে বলুন যে কতটা ভালবাসেন সন্তানকে। তার কতটা মূল্য রয়েছে অভিভাবকের কাছে। নিজেকে প্রকাশ করতে দিন সন্তানকে, কোনও রকম বাধা দেবেন না। কিন্তু একা করে দেবেন না সন্তানকে। যে কোনও রকম ধারালো জিনিস, বিষাক্ত কীটনাশক বা ঘর পরিষ্কারের জিনিস, ক্ষতিকারক ওষুধ সরিয়ে ফেলুন সন্তানের চোখের সামনে থেকে।

যদি আপনার সন্তান ইতিমধ্যেই থেরাপিতে থাকে, তা হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনস্তত্ত্ববিদের পরামর্শ নিন। সংকটকালীন হটলাইন নম্বর বা আপৎকালীন মানসিক স্বাস্থ্য ক্লিনিকে ফোন করতে পারেন। যখন আমাদের জীবনে ঘাত প্রতিঘাত আসে, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে বলার চেয়েও মনে হয় কেউ বলুক, সব কিছু যে ঠিক নেই এতে কোনও অসুবিধা নেই। শুধু কথা বলার একটা মানুষ চাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, কেউ আমাদের কথা শুনুক।

(মিনু বুধিয়া একজন সাইকোথেরাপিস্ট, কাউন্সেলর এবং টেড-এক্স স্পিকার। তিনি কেয়ারিং মাইন্ডস (সুপার স্পেশালিটি মেন্টাল হেলথ ক্লিনিক), আইক্যানফ্লাই (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য প্রতিষ্ঠান)-এর প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্তা। ২০১৮ সালে 'ডেথ অব আ ক্যাটারপিলার' নামে একটি আত্মজীবনী লেখেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর মা এবং অবসাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা রয়েছে বইটিতে)

Anandabazar Patrika (Online)- 26.07.2020

বিশেষ মানুষদের কথা

সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...

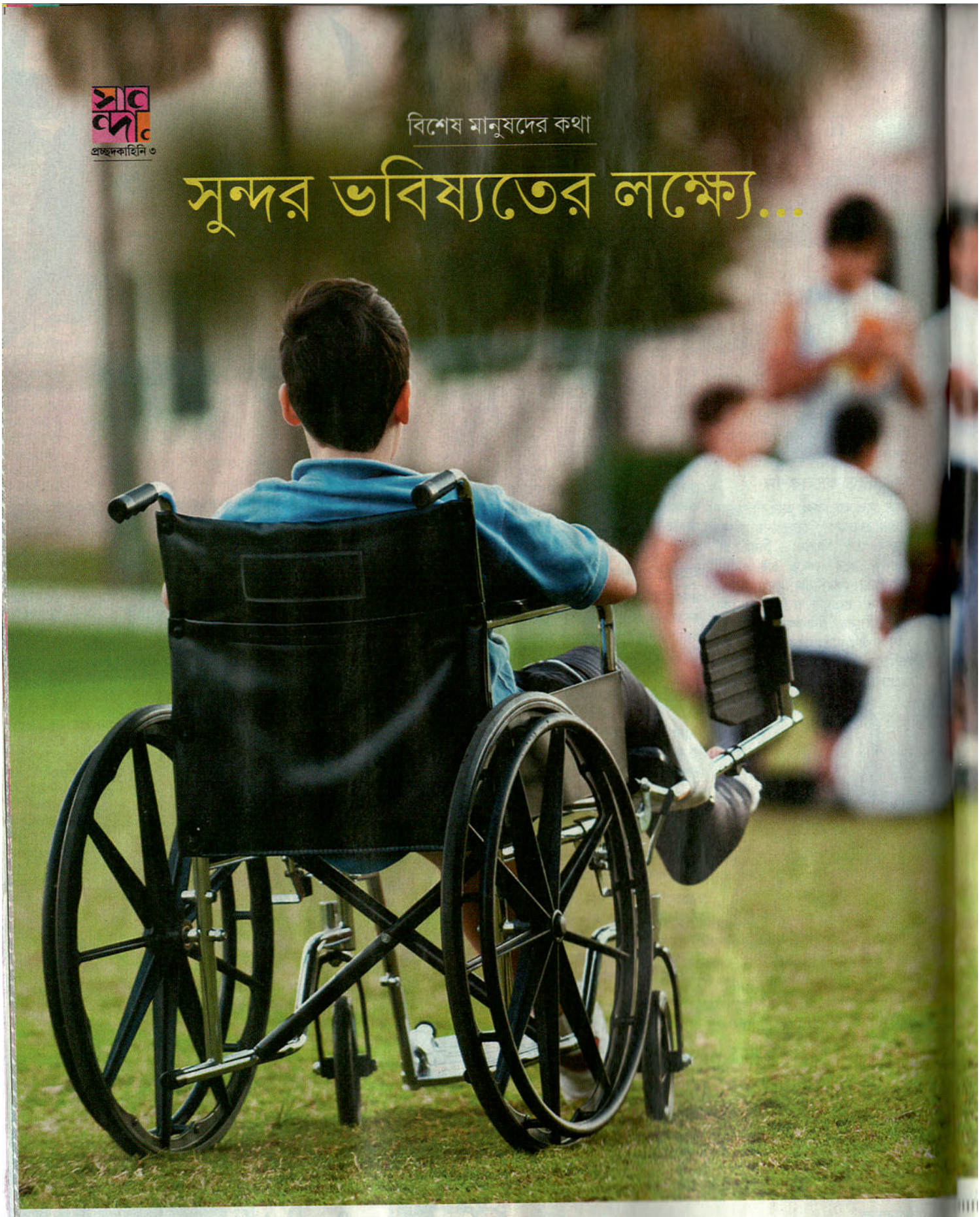

বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের বিকাশে অভিভাবকত্ব এবং শিক্ষার গুরুত্ব কতটা? আলোচনায় সাইকোথেরাপিস্ট তথা কাউন্সেলর মিনু বুধিয়া। স্পেশ্যাল এডুকেশনের পরামর্শে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড স্কুলের ফাউন্ডার ডিরেক্টর ড. অভয় কৃপালানি। লিখছেন সায়নী দাশশর্মা।

প্রতিটা শিশুর বেড়ে ওঠার পিছনেই তার পরিবার, বাবা-মা এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বড় ভূমিকা থাকে। শিশুর যাবতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, চরিত্র গঠনের দায়িত্ব অভিভাবকদেরই। পাশাপাশি একটা বয়স অবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতা থেকে সন্তানকে রক্ষা করার বিকাশের পথে তৈরি হওয়া সব বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধেও তাঁদেরই ঢাল হয়ে দাঁড়াতে হয়। আবার সমাজের মূলস্রোতে টিকে থাকতে, তথা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শিক্ষার। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাঠই শিশুরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জন করে। সন্তান বিশেষভাবে সক্ষম হলেও এই প্রয়োজনগুলো কিন্তু বদলায় না। হয়তো তাদের প্রতিকূলতা আলাদা, প্রয়োজন ভিন্ন, তবে অভিভাবকত্ব এবং শিক্ষার প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রেও সমান। তাই সমাজের তথাকথিত 'স্বাভাবিক' স্তরে সন্তানের জায়গা তৈরি করতে, স্পেশ্যাল পেরেন্টদের গোড়া থেকেই এই দু'টো বিষয়ে নজর রাখা জরুরি...

বাবা-মায়ের কর্তব্য

বাচ্চা বিশেষভাবে সক্ষম, এই সত্যিটার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জই স্পেশ্যাল পেরেন্টদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। একবার সেই বাধা পেরিয়ে গেলে বাকি পথ চলা তুলনায় সহজ। সব অভিভাবকদেরই সন্তানের প্রয়োজন বুঝে সেই মতো তাকে বড় করে তোলা, তার মতো করে পথ চলতে শেখানো জরুরি। তবে যেহেতু এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো আলাদা, তাই সন্তানের প্রয়োজন বুঝতে বাবা-মায়েদের নিজেদের প্রস্তুত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বই পড়লে, স্পেশ্যাল কোর্স বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করলে বা স্পেশ্যাল এডুকেশনের প্রশিক্ষণ নিলে সন্তানকে পথ দেখাতে সুবিধা হবে। অভিভাবক নিজে এই বিষয়ে যত জানবেন, ততই সন্তানকে বুঝতে সুবিধে হবে। সন্তানের যাবতীয় অভ্যাস, তার মুড সুইং, শারীরিক ছোট-বড় পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি প্রতিটা বিষয়েই স্পেশ্যাল পেরেন্টদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে সন্তানকে আর্থিক এবং মানসিকভাবে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করাও প্রাথমিকভাবে বাবা-মায়ের দায়িত্ব। আর্থিক স্বাধীনতার জন্য ছোট থেকেই সঞ্চয়ের প্রতি নজর দেওয়া জরুরি। যদি একাধিক সন্তান থাকে, সে ক্ষেত্রে স্পেশ্যাল চাইল্ডের সঙ্গে তাদের বন্ডিংয়ের প্রতিও জোর দিন। কথোপকথনের মাধ্যমে বাকি সন্তানদের ওর সমস্যা, পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করুন। আপনি যেমন স্পেশ্যাল পেরেন্ট, তেমনই ওরাও যে স্পেশ্যাল সিবলিং, এটা বুঝতে শেখান। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো বিষয়ে ওদের একসঙ্গে সামিল করুন, যাতে সবার মধ্যে সহজ,

যেহেতু চ্যালেঞ্জগুলো আলাদা, তাই সন্তানের প্রয়োজন বুঝতে স্পেশ্যাল পেরেন্টদের নিজেদের প্রস্তুত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

"যদি সন্তানকে তার মতো করে গ্রহণ করতে, ভালবাসতে পারেন, তাহলে সমাজ সেই মনোবল ভাঙতে পারবে না।" — মিনু বুধিয়া

স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি হয়। এতে পরবর্তীকালে ভাই-বোনেরাই কেয়ারগিভারের ভূমিকা নিতে পারবে।

স্বাবলম্বী করে তুলুন

বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হলে তার চাহিদা, ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া ভীষণ জরুরি। ওদের নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব গতিতে সবকিছু শিখতে দিন। মনে রাখবেন, প্রত্যেকেই কিন্তু স্বতন্ত্র। প্রত্যেকে নিজের মতো করে শিখবে, জানবে। যদি বাচ্চা শারীরিকভাবে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে গোড়া থেকেই বেসিক জিনিসগুলো শেখান। পার্সোনাল হাইজিন মেনে চলা, অর্থাৎ হাত ধোওয়া, টয়লেটের ব্যবহার, নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, স্নান করা, দাঁত ব্রাশ করা, শ্যাম্পু করা ইত্যাদির অভ্যেস করান। নিজেকে গ্রুমড রাখাও জরুরি। নিয়মিত নখ কাটা, চুল-দাড়ি ট্রিম করা বা মেয়েদের ক্ষেত্রে ওয়্যাক্সিং, শেভিং ইত্যাদি অভ্যাস থাকা ভাল। বিশেষভাবে সক্ষম টিনএজার মেয়েদের ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর মেক-আপ করা বা ছেলেদের হেয়ার জেল, মুজ় ইত্যাদি ব্যবহারের অভ্যাস থাকলে ভাল। মোট কথা, নিজের প্রতি যত্ন নেওয়া শেখাতে হবে। এতে ওদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।

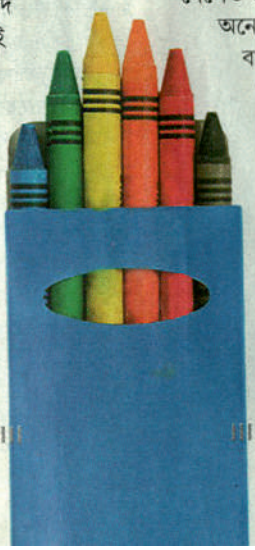

বাবা-মা হিসেবে আপনার সন্তানকে ঘিরে অনেক পরিকল্পনাই থাকতে পারে। তবে ওদেরও যে নিজস্ব শেখার ক্ষমতা রয়েছে, সেটা ভুলে যাবেন না। যা যা শিক্ষা ওকে দিতে চান, সেটা ওর ক্ষমতা বুঝে দিন। আত্মবিশ্বাস তখনই বাড়বে, যখন ওদের মানসিক বয়স অনুযায়ী শিক্ষা এবং সামাজিকতার পাঠ পড়ানো হবে। কোনও কিছু শেখাতে শেখাতে তখনই প্রশ্ন করুন, যখন আপনি নিজে নিশ্চিত হবেন যে ও উত্তর দিতে পারবে। কোনও খেলা শেখানোর সময় একদম প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করুন। ওদের যদি তার চেয়ে বেশি শেখার ক্ষমতা থাকেও, তাও ইজ়ি লেভেল থেকেই শুরু করুন। প্রথম দিকে খেলতে খেলতে যদি ওরা জিততে শুরু করে, সে ক্ষেত্রে ওদের আগ্রহও বাড়বে এবং আরও খেলার উৎসাহ পাবে। এরপর ধীরে ধীরে কঠিন লেভেলে গেলেও ওদের শেখার আগ্রহ বজায় থাকবে।

অনেক অভিভাবকই নানা কারণে বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের নিয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠান বা সামাজিক গ্যাদারিংয়ে যেতে চান না। এতে তারা সোশ্যালাইজ় করাও শেখে না। পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলে, সকলের মধ্যে থাকলেও কিন্তু ওরা অনেক কিছু শিখবে। কনফিডেন্স তো পাবেই, এমনকী বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করা উচিত, তাও বুঝবে। বাড়িতে অতিথি এলে ওকেই বলুন তাঁদের ওয়েলকাম করতে। যদি সম্ভব হয়, ওদের চা-জল অফার করার মতো দায়িত্বও দিতে পারেন। যদি কোনও গ্যাদারিংয়ে কাউকে দেখলে সন্তান অস্বস্তি বোধ করে বা কেউ জড়িয়ে ধরতে চাইলে আপত্তি করে,

তাহলে জোর করবেন না। ওদের পার্সোনাল স্পেস এবং বাউন্ডারির সম্মান করা জরুরি।

যদি সন্তান নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথা জানাতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে ওকে নিজের জিনিস নিজেই বাছতে বলুন। তা খাবার হোক বা পোশাক, এসির তাপমাত্রা হোক বা গান, ওদের স্বাচ্ছন্দ্য, পছন্দের গুরুত্ব দিন। যদি বাচ্চা অনেক চয়েসের মধ্যে কনফিউজ়ড হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে দু'টো জিনিস দিয়ে ওকে বলুন নিজের মতো পছন্দ করতে। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা পছন্দ-অপছন্দবোধ সম্পর্কে ওদের ধারণা তৈরি হবে। আবার যদি কোনও পোশাক ওর পছন্দ না হয়, সে ক্ষেত্রে তা জোর করেও পরাবেন না। যাই পরান না কেন, তা যেন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়, এবং দেখতেও ভাল লাগে। পুরনো, ছেঁড়া জামাকাপড় পরাবেন না। শুনতে খারাপ লাগলেও, এখনও আমরা এমন সমাজে থাকি, যেখানে পোশাক-আসাক সোশ্যাল স্ট্যাটাসের অন্যতম মাপকাঠি। ছোটরাও খুব সহজেই এই বিষয়গুলো শিখে নেয়। তাই ওদের যতটা সম্ভব প্রেজ়েন্টবল রাখার চেষ্টা করুন।

শিক্ষা, স্কুলিং এবং বাবা-মায়ের ভূমিকা

বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই শিক্ষণীয়। আর তাই এ ক্ষেত্রে বাবা-মায়েদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পেশ্যাল চাইল্ডরা মূলত পুনরাবৃত্তি থেকে শেখে। ফলে প্রতিদিন বাড়িতে যা বলা হচ্ছে বা করা হচ্ছে, তা ওরা আংশিকভাবে হলেও শেখে। সেই কারণেই ওদের বিভিন্ন ধরনের লাইফ স্কিল, দৈনন্দিন কাজ, পড়াশোনা বা খেলাধুলো শেখানোর কোনও ন্যূনতম বয়স হয় না। মোটামুটি তিন বছর বয়স থেকেই আর্লি ইন্টারভেনশন এডুকেশন শুরু করা যেতে পারে। প্রি-ভোকেশনাল এডুকেশন মোটামুটি ১০ বছর বয়স থেকে শুরু করা যেতে পারে। এছাড়া বাচ্চার শারীরিক শক্তি এবং

বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে প্রয়োজন হলে কোনও স্পেশ্যাল টিউটর রাখতে পারেন। অথবা স্পেশ্যাল স্কুলেও ভর্তি করাতে পারেন। স্পেশ্যালাইজ়ড ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় টুলস এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা তো থাকেই, পাশাপাশি এই ধরনের স্কুলের সবচেয়ে বড় সুবিধে, এখানে বাচ্চারা সোশ্যালাইজ় করার সুযোগ পায়। স্পেশ্যাল চিলড্রেনদের কাছে স্পেশ্যাল স্কুল আসলে একটা নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে নিজের মতো করে থাকায় কোনও বাধা নেই। কেউ সেখানে সমাজের ঠিক করে দেওয়া মাপকাঠিতে ওদের বিচার করে না। সেই কারণেই খুব লাজুক বা অত্যন্ত দুরন্ত বাচ্চারাও স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সাহচর্য উপভোগ করতে শেখে। আসলে, যতই আমরা সামাজিক ইনক্লুশনের কথা বলি না কেন, এই সমাজ এখনও ইকুয়ালিটির কনসেপ্টে অভ্যস্ত নয়। এখনও বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের সাধারণ স্কুলে পাঠালে তারা প্রতিনিয়ত বুলিংয়ের শিকার হয়। ইনক্লুসিভ স্কুলেও কিন্তু এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে, অথচ স্পেশ্যাল স্কুলে এমন ঘটনা

শোনা যায় না। আসলে সমাজের চোখে যারা 'স্বাভাবিক', তারা সেই চেনা বৃত্তের বাইরে বাকি সব কিছুই অস্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রয়োজন, তাদের প্রতিকূলতা সম্পর্কে অন্যান্য বাচ্চাদের অবগত করা হয় না বলেই, এখনও এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তাই সন্তানকে সমাজের মূলস্রোতে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে হলে সবার আগে তাদের প্রয়োজন বোঝার চেষ্টা করুন। ও কোন ধরনের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে, কোন স্কুল ওর বেশি ভাল লাগছে, সেটা বুঝতে চেষ্টা করুন। স্রেফ নিজের ইচ্ছের তাগিদে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করাবেন না। এতে সমাজের প্রতি ওর উলটো মনোভাব তৈরি হতে পারে।

ইনক্লুসিভ স্কুল মূলত দু'রকম হয়। বাচ্চার যদি বর্ডারলাইন বা মাইল্ড ইন্টেলেকচুয়াল চ্যালেঞ্জ থাকে, তারা সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে। বা যদি সাধারণ স্কুলে স্পেশ্যাল চিলড্রেনদের জন্য বিশেষ ক্লাসরুমের ব্যবস্থা থাকে, সে ক্ষেত্রেও একই স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ থাকে। কিন্তু স্পেশ্যাল চাইল্ডদের লার্নিং স্পেস এমন হওয়া দরকার, যেখানে তারা নিজের ছন্দে নতুন জিনিস শিখতে পারে বা যেখানে তাদের সমস্যাগুলো সকলে বুঝতে পারে। এতে ওদের নানা বিহেভিয়ারাল এবং ইমোশনাল সমস্যাও স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর বাচ্চা সেই পরিবেশ কোথায় পাচ্ছে, সেটা বাবা-মাকেই বুঝতে হবে।

সমাজের বাধা পেরিয়ে...

এই প্রসঙ্গে বলব, আপনি আপনার সন্তানকে কীভাবে ট্রিট করছেন, তার উপরই নির্ভর করবে ওর সঙ্গে বাইরে কীভাবে ট্রিট করা হচ্ছে। বাবা-মা হিসেবে যদি সন্তানকে তার মতো করে গ্রহণ করতে পারেন, তাকে ভালবাসতে পারেন, পরিবার-পরিজনের কাছে সন্তানের কথা মন খুলে বলতে পারেন, তাহলে সমাজ সেই মনোবল ভাঙতে পারবে না কখনওই। কিছুক্ষেত্রে অবশ্য অভিভাবকদেরই ঢাল হয়ে দাঁড়াতে হবে, ওদের হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। এতে অন্তত কাছের মানুষদের কাছে টেকেন ফর গ্রান্টেড হওয়া থেকে সন্তানকে রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য প্রাথমিকভাবে সেই পথটা আপনাকেই খুঁজে নিতে হবে।

স্পেশ্যাল টিনদের ক্ষেত্রে

নানা ধরনের শারীরিক পরিবর্তন এবং হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে স্পেশ্যাল টিনদের মধ্যে অহরহ মুড সুইং, অতিরিক্ত মেজাজ, খিটখিটে হাবভাব দেখা যায়। তাই বাচ্চারা এই বয়সে এলে অভিভাবকত্বের চ্যালেঞ্জগুলোও আরও বেড়ে যায়। অনেকক্ষেত্রেই বাবা-মায়েরা বুঝতে পারেন না, সন্তান কী চাইছে বা কেন চাইছে। মনে রাখবেন, এই বয়সে এই ধরনের বিহেভিয়ারাল পরিবর্তন কিন্তু ওদের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক। যারা নিজেদের চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে, তারা নিজের সমস্যার কথাও জানাতে পারে। কিন্তু যারা সেটা পারে না, তাদের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি শারীরিক পরিণতি থেকে শারীরিক চাহিদা তৈরি হয়, অন্য ধরনের অনুভূতি জাগতে শুরু করে মনে। এই বয়সে ওদের সেফটি সার্কল সম্পর্কে অবগত করা একান্ত জরুরি। গুড টাচ এবং ব্যাড টাচ সম্পর্কে বারবার বলা, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ওরা কী দেখছে, সেদিকে সদাসতর্ক থাকা দরকার। সন্তানের বোঝার ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে বয়সোচিত আদবকায়দা, পিরিয়ড, হস্তমৈথুন ইত্যাদিও শেখানো প্রয়োজন।

পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানকে 'না' বলতেও শিখুন। বিষয়টা খুব একটা সহজ নয়। কারণ ওরা যে সুখ থেকে বঞ্চিত, সব বাবা-মা-ই সেই অভাব তাঁদের স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে মেটাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু কিছু আচরণ, অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটাও ওদের ভালর জন্যই জরুরি। মনে রাখতে হবে, বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের চিন্তাভাবনা সরল হলেও, ম্যানিপুলেট করার কৌশল ওরাও জানে। তাই 'না' বলার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, ওর বায়না বা জেদের কাছে সহজে পরাজয় স্বীকার করে নেবেন না। কারণ যদি তা করেন, তাহলে সেটাই অভ্যেসে পরিণত হবে। আপনি না বলবেন, তারপর ও জেদ করবে এবং ক্রমে আপনিও পরাজয় মেনে নেবেন। না বলার অর্থ যেন না-ই হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এতে কঠিন সময়েও অনুশাসনের মধ্যে থাকবে ওরা।

না শুনে যদি বাচ্চা রাগারাগি করে বা তাদের মনখারাপ হয়, সেক্ষেত্রে কোনও কটু কথা বলবেন না, বিশেষ করে যা বলতে চান না। রাগের মাথায় জিনিসপত্র ভাঙলে বা মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেলেও সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

আশিস চক্রবর্তী, *স্পেশ্যাল পেরেন্ট*

আমার ছেলে আকাশের জন্মের ছ'মাসের মাথায় সেরিব্রাল পলসি ধরা পড়ে। এই অসুখে মূলত মোটর ফাংশন কাজ করে না। ফলে হাঁটাচলা, কথা বলা কোনওটাই স্বাভাবিকভাবে হয় না। সবকিছুই ওদের শেখাতে হয়। আকাশ যেমন প্রথম হাঁটতে শেখে পাঁচ বছর বয়সে। শারীরিক প্রতিকূলতা তো ছিলই, তবে আমরা অভিভাবক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বাধা পেয়েছি সমাজ থেকে। ওর আইকিউ বরাবরই অ্যাবাভ অ্যাভারেজ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র ও ঠিকমতো দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারে না বলে, প্রচুর স্কুল ওকে রিফিউজ করে। শেষ পর্যন্ত সল্টলেকের একটি স্কুলে ভর্তি করাই। প্রত্যেক ক্লাসেই ও টপার ছিল। তবুও বহুবার ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ ওকে টিসি দিতে চেয়েছে। যদিও ওর সহপাঠী এবং স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি আমরা। ওই স্কুল থেকেই ও উচ্চ মাধ্যমিক দেয়। ৯৩.৫% মার্কস পেয়ে বি.কম অনার্সে ভর্তি হয়। তারপর ক্যাটের প্রিপারেশন নেয়। দেশের অন্যান্য প্রান্তের তিনটে আইআইএম থেকেও কল পেয়েছিল। কিন্তু ও কলকাতা থেকেই এমবিএ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বছর ও এমবিএ শেষ করেছে। ওর ইচ্ছে কলেজে পড়ানোর। আপাতত সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে। নিজের প্রায় সব কাজই ও নিজে করতে পারে। আর এর প্রায় পুরো কৃতিত্বই ওর মায়ের। আমার স্ত্রীর (বহ্নি চক্রবর্তী) অসম্ভব মনের জোর। কখনও কখনও আমিও হাল ছেড়ে দিতাম, কিন্তু ওর মনোবল ভাঙেনি। দীর্ঘদিন ধরে ধৈর্য ধরে ও সব শিখিয়েছে। ছেলেকে স্কুলের গেট অবধি পৌঁছে দেওয়া থেকে কোন থেরাপিতে একটু উপকার পাবে, সেই সব খবর জোগাড় করা, অন্যান্য স্পেশ্যাল পেরেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, সবটুকুই ও করত। স্কুলে আজীবন আকাশের ১০০% অ্যাটেন্ড্যান্স ছিল। আকাশেরও অবশ্যই কৃতিত্ব রয়েছে। সেরিব্রাল পলসি নিয়েও যে ও এতদূর এগোতে পেরেছে, এটা ভাবলে সত্যিই গর্ব হয়। আমার মতো যাঁরা স্পেশ্যাল পেরেন্ট রয়েছেন, প্রত্যেককে একটাই কথা বলব যে, লড়াইটা সোজা নয় ঠিকই। তবে মনের জোর নিয়ে এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই সাফল্য আসবে। সমাজের মূলস্রোত থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবেন না। নিজের উপর এবং সন্তানের উপর আস্থা রাখলে সব বাধাই পেরিয়ে যাবেন।

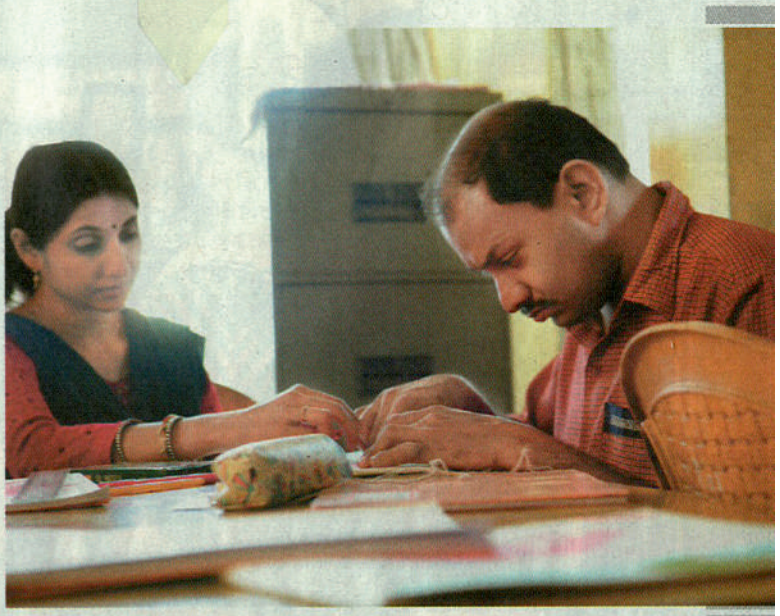

বাবা-মায়েদের ভাল থাকাও জরুরি

বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের অভিভাবকত্ব মুখের কথা নয়। মানসিক টানাপড়েন তো রয়েইছে, পাশাপাশি সময়ে-অসময়ে ক্লান্ত লাগতে পারে, হতাশা ভিড় করতে পারে মনে। তাই বাবা-মায়েদেরও নিয়ম করে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সারাদিনের বার্নআউটের জন্য নিজের জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখুন। ১৫ মিনিট হলেও, প্রতিদিন কিছুটা সময় শুধু নিজের সঙ্গে কাটান। যা যা করতে ভালবাসেন, সেগুলো করুন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, কফিশপে যাওয়া বা পছন্দের সিনেমা দেখাও এই বিশ্রামের অঙ্গ হতে পারে।

প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে, এখন বাড়ির বাইরে থাকলেও সন্তানের গতিবিধির উপর নজর রাখার সুযোগ রয়েছে। চাইলে যখন খুশি ভিডিও কল করেও দেখে নিতে পারেন, সন্তান ঠিক আছে কিনা। কাজেই কিছুটা সময় নিজের মতো করে কাটানো নিয়ে অপরাধবোধ বা দুশ্চিন্তা, কোনওটাই যুক্তিযুক্ত নয়। মনে রাখবেন, সকলেরই সাহায্যের দরকার হয়। তাই প্রয়োজন হলে কাছের মানুষ, পরিবার, পরিজন, বন্ধুদের সাহায্য নিন। ওঁদের সাহায্য পেলে আপনি খানিকটা সময় বিশ্রাম নিতে পারবেন জানলে, ওঁরাও সাহায্য করার জন্য নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। সম্ভব হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কেয়ারগিভারের সাহায্যও নিতে পারেন। মাঝেমধ্যে বিশ্রাম নিলে আলাদা স্ফূর্তি পাবেন। মনও ভাল থাকবে, শরীরও সুস্থ থাকবে, যা সন্তানকে ভাল রাখার জন্য জরুরি।

যোগাযোগ: ৯৮৩৬৪০৩৭৬৬
ই-মেল: askminubudhia@caringminds.co.in

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

আজকাল

১ জুলাই ২০২২

বিশেষ বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র

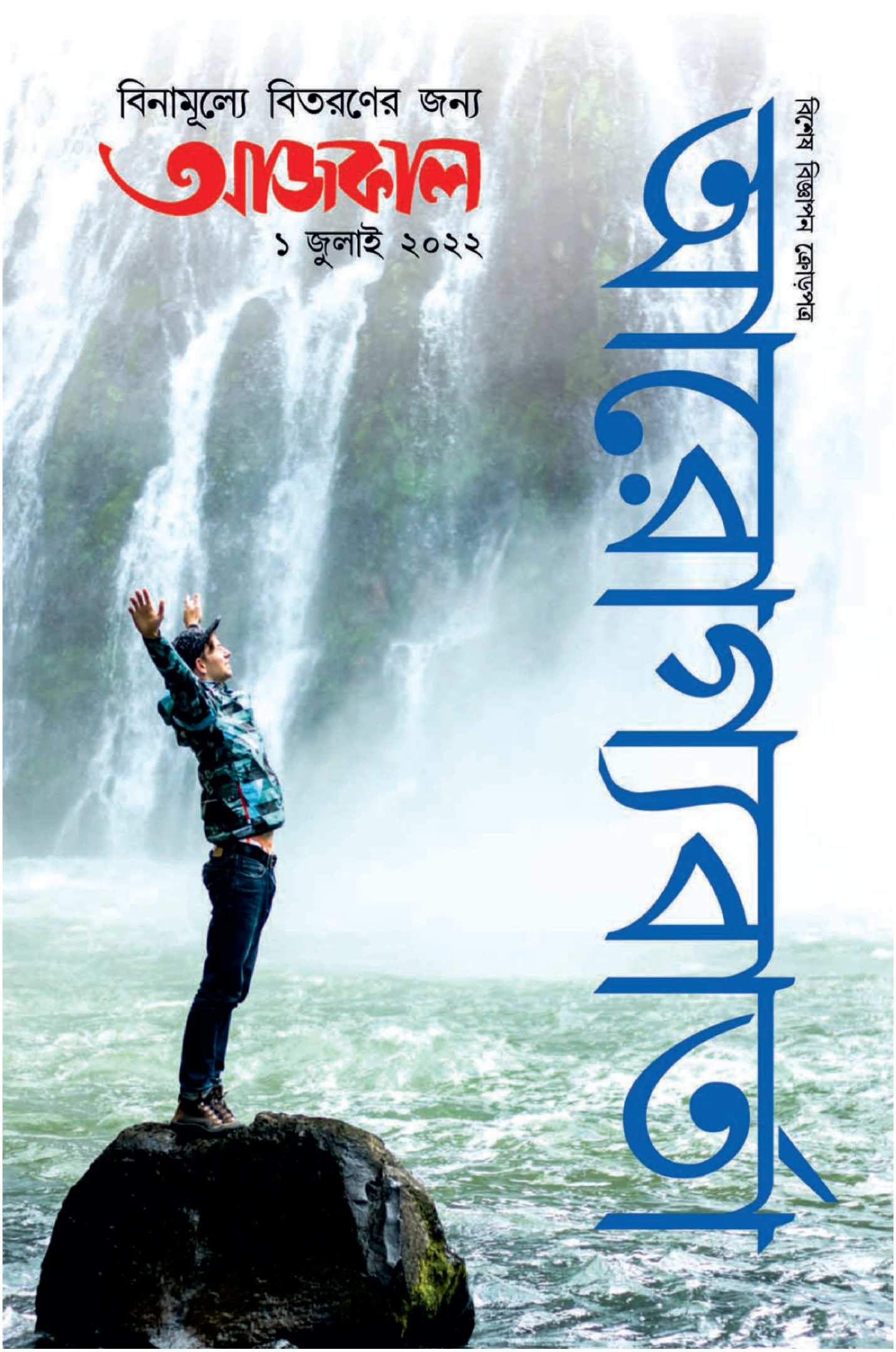

মিনু বুধিয়া

সুপার মম

আগে যখন লোকে আমাকে 'সুপারউওম্যান' , বিশেষ করে 'সুপারমম' বলে ডাকত, তখন এটাকে আমি দারুণ একটা প্রশংসা বলেই মনে করতাম। আমি বোঝাতে চাইছি, এতে ভুল কোথায়? প্রত্যেকেই তাঁর কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি চান।

বাড়িতে কিংবা অফিসের কাজে আমি সব সময়ই ছিলাম সুপার। আমি খেয়ালে রাখতাম আমার সংসার যেন নির্ঝঞ্ঝাটে চলে যাতে করে আমার মেয়েরা, আমার স্বামী এবং আত্মীয় স্বজনেরা তাদের দরকারি সব জিনিস যেন অনায়াসে, হাতের কাছেই পেয়ে যায়। প্রতিদিনি আমার তিনটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ আলাদা আলাদা অফিস থেকে চালাই। এজন্য সকালে একবার ও সন্ধেয় একবার সময় দিই। প্রতিদিন দুপুরে আমি বাড়ি ফিরে আসি আমার ছোট মেয়ে স্কুল থেকে ফেরার আগেই (আমার ছোট মেয়ে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন)। তখন আমরা দুপুরের খাবার খাই, দুজনে একসঙ্গে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটাই এবং এরপর নিজের কাজে ফিরে যাই। এরই ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক দেখাসাক্ষাতের পর্ব সেরে ফেলি এবং নিজের জন্যও কিছু সময় রাখি। এর ফলে আমার মনে হতে আমার এই ছোট্ট বিশ্বটাকে কাল্পনিক দশ হাত দিয়ে আমি যেন সফলভাবে লোপালুপি করছি এবং সেই সময় একবারও আমার এই কথাটা মনে হয়নি যে, খুব ধীরে ধীরে আমি আমার শক্তি ক্ষয় করে ফেলছি।

তারপর হঠাৎ একদিন জীবনের ছোটখাটো সব বিষয়ে আমি আগ্রহ হারাতে শুরু করলাম। আমার তখন প্রতিদিন মোটেই জ্বলে একটা বাল্কের মতো কাজ করতে ইচ্ছে করত না। আমি দেবী নই। লোপালুপি খেলায় ওস্তাদও নই। ক্রিপ্টনে আমার জন্ম হয়নি এবং নিশ্চিতভাবেই কোনও রেডিওঅ্যাক্টিভ ইউনিট থেকে পাওয়া আমার বিশেষ কোনও বিশেষ ক্ষমতা আমার নেই।

বাড়ি এবং অফিস দুটোই আমার প্রিয় জায়গা। কিন্তু দুজায়গাতেই কাজের অতিরিক্ত চাপ নেওয়ার ফলে সেটা আমার স্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি করছিল। ফলে আমার মনে নানান চিন্তার উদয় হল।

● এরপর ১৪ পাতায়

● ১২ পাতার পর

আমি ভাবতে শুরু করলাম কেন আমাকে জগতের কাছে ভাল মা ও ভাল বস হয়ে প্রতিদিন সবকিছু সামলে চলতে হবে? কেন চাকরি বা ব্যবসা করা মায়েদের অবশ্যই শেষ শক্তিটুকুকে পর্যন্ত নিঃশেষিত করে ফেলতে হবে? কেন এই ২০২২ সালেও সমাজের প্রত্যাশা এবং আমাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক ও প্রজন্মগত একপেশেমি আমাদের লিঙ্গ সমতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে?

এখানে উল্লেখ করছি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা কয়েকটি অবাস্তব কল্পকথা সম্পর্কে যা এখনও পর্যন্ত মায়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে চলেছে।

কল্পকথা: মা, তুমি তো সব সময় বাড়িতেই থাক। তাই রোজই তোমার ছুটি।

বাস্তবতা: রান্না করা, ঘরদোর সাফ করা, মুদির দোকানের জিনিস আনা, খাবার তৈরি করা, স্কুলের হোমটাস্ক বাচ্চারা করল কিনা দেখা, বাচ্চাদের খেলার মাঠে কিংবা হবি ক্লাসে নিয়ে যাওয়া, এবং এরকম আরও কত কাজ যে মায়েদের করতে হয়। মনে রাখা দরকার, বাবারা যে নিশ্চিন্ত মনে অফিসে গিয়ে কাজ করতে পারে কারণ মায়েরা সংসারের খুঁটিনাটি সব জিনিসের খেয়াল রাখেন।

কল্পকথা: তুমি এই প্রথমবার মা হয়েছে, তাই সন্তানকে ঘিরেই আবর্তিত হতে হবে তোমার জগৎ।

বাস্তবতা: যে মা নিজের সন্তানের জন্মদাত্রী তিনি শুধুমাত্র একটা বুকের দুধ উৎপাদনকারী, বাচ্চাদের খাওয়ানো এবং সাফসুতরো রাখার মেশিন নন। তিনি যতই নিজের সন্তানকে ভালবাসুন না কেন, সব মা-ই চান নিজেদের জন্য কিছুটা সময়। সন্তানজন্মের পর অনেক মা-ই বিষাদে আক্রান্ত হন। এটা মানসিক স্বাস্থ্যের এমন একটা সমস্যা যা সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিংবা শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এজন্য তাঁরা মনে মনে নিজেদেরই দোষী সাব্যস্ত করেন। অতএব তাঁদের অপরাধবোধ যাতে আরও বেড়ে না যায় সেজন্য দয়া করে তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন এবং তার বদলে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করুন।

অতিকথা: ভাল মা হতে গেলে নিজের কেরিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবন বিসর্জন দিতে হবে।

বাস্তবতা: সুখী মা অবশ্যই ভাল মা। যে মা চাকরি বা ব্যবসা করেন তিনি আর্থিকভাবে অনেক বেশি স্বাধীন, তাঁর একটা পেশাদারি জগৎ আছে এবং আছে আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস আসে নিজের জীবনসঙ্গীর ওপর তিনি পুরোপুরি নির্ভরশীল নন বলে। যে কঠোর পরিশ্রম তিনি করেন তার মাধ্যমে তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে ইতিবাচক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করেন, সঞ্চারিত করেন নিজের কাজ ভাল করে করার মূল্যবোধ, বুঝিয়ে দেন আত্মসম্মানের মূল্য কী এবং একই সঙ্গে এই বার্তা দেন যে মানুষের গোটা জীবনটাই চ্যালেঞ্জে ভরা যাকে অতিক্রম করতে করতে যেতে হয়। যে মা তাঁর বাচ্চাদের এই সব শিক্ষা দেন তিনিই ভাল মা। চাকরি করাটা একটা সম্ভাব্য ঢাল। স্বামীরা মায়েদের বা বাচ্চাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে সেই চাকরিটাই সবাইকে রক্ষা করে।

অতিকথা: যদি দেখা যায় বাচ্চা স্কুলের পড়াশোনা ভাল করে রপ্ত করতে পারছে না তাহলে মাকেই চাকরি ছেড়ে তার পুরো সময়টা বাচ্চাকে দিতে হবে।

বাস্তবতা: 'তুমহারি সুল্লু' ছবিতে একটা চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। যখন স্কুলে বাচ্চারা সমস্যায় পড়ে, স্কুল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার উপক্রম হয়, তখন চাকরি করার জন্য মাকেই দোষী করা হয় এবং তিনি যে কাজ করেন সেদিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকানো হয়। কিন্তু কখনই বাবাদের দিকে এই একই অভিযোগের আঙুল তোলা হয় না। যখন বাচ্চাদের স্কুলের সমস্যা দেখা দেওয়ার পর মা কাজে যেতে তৈরি হন, তখন তাঁর বোনেরা ও পরিবারের লোকেরা মা হিসাবে তাঁর নিষ্ঠা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন এবং চাকরি ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু বাবাকে কেউই চাকরি ছাড়তে বলেন না। কিন্তু সবারই মনে রাখা উচিত যে, এটা ২০২২ সাল। একথা মেনে নেওয়ার উপযুক্ত সময় এখন এসে গেছে যে ছেলেমেয়ে মানুষ করাটা বাবা এবং মা, দুজনেরই দায়িত্ব।

কল্পকথা: যদি কোনও মা নিজেকে নিজের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে অসমর্থ হন এবং যদি তাঁর কাউন্সেলিংয়ের দরকার হয়, এর মানে মা হিসেবে তিনি ব্যর্থ।

বাস্তবতা: একটা সাধারণ ভুল ধারণা আছে যে যাঁরা উদ্বেগ, বিষাদ বা হতাশা, কিংবা অন্য কোনও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন কাউন্সেলিং শুধুমাত্র তাদেরই জন্য। যিনি মনে মনে অনিয়ন্ত্রিত আবেগে উদ্বেল, যিনি সব ধরনের আবেগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, এবং নিজেদের অভ্যস্ত স্বাভাবিক জীবনযাপনে মানিয়ে চলতে গিয়ে যাঁকে রীতিমতো কসরৎ করতে হচ্ছে, তাঁদের সবারই কাউন্সেলিং দরকার হতে পারে। সুতরাং, যদি নতুন মা হন, কিংবা এমন মা যার কোল খালি হয়েছে, তাঁকে সাহায্য করতেই হবে। মনে রাখতে হবে যে এমন মাকে সাহায্য করা মানে এই নয় যে তিনি মা হিসাবেই ব্যর্থ। এর মানে তিনি এমন একজন মা যিনি নিজের সম্পর্কে যত্নশীল হতে চান কারণ আসলে তিনি নিজের সন্তানদের নিয়ে যথেষ্টই যত্নশীল।

প্রিয় মায়েরা, কখনও সখনও এক টুকরো মানসিক চাপের মতো, অপরাধবোধের একটা হাল্কা ছোঁয়া, আমাদের হুঁশ ঠিক রাখতে পারে। তবে ২৪ ঘণ্টা ৭ দিনের মা হতেই হবে নাহলে লোকে খারাপ ভাববে, এই অপরাধবোধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। ২৪ ঘণ্টা ৭ দিনের মা বাচ্চা কিংবা মা কারোর পক্ষেই ভাল নয়। খুব জনপ্রিয় একটা ওয়াশিং পাউডারের বিজ্ঞাপনে যেমন বলা হয়, আসুন আমরা #ভারটা ভাগ করে নিই। পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তিতে চলা এক সমান অধিকারের সংসার — এখন এদিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে। ভুলে গেলে চলবে না, সন্তান মানুষ করাটা একটা টিম গেম। তাই না?